ATMADEEP

An International Peer- Reviewed Bi- monthly Bengali Research Journal
ISSN: 2454–1508
Impact Factor: 4.5 (IIFS), 8.5 (IJIN)
Volume- II, Special Issue, February, 2026, Page No. 1-13
Published by Uttarsuri, Sribhumi, Assam, India, 788711
Website: https://www.atmadeep.in/
DOI: 10.69655/atmadeep.vol.2.specialissue.W.262

আখ্যান বিহীন আখ্যান-এ কার্নিভালের ব্যঙ্গাত্মক হাসি- 'মসোলিয়ম'

ড. সেখ মোফাজ্জাল হোসেন, *সহকারী অধ্যাপক ও বিভাগীয় প্রধান, বাংলা বিভাগ, সামসী কলেজ, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত*

Received: 26.12.2025; Accepted: 28.01.2026; Available online: 28.02.2026
©2026 The Author(s). Published by Uttarsuri. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

Abstract

In Mausoleum, everything is deconstructed. The counter-text is infused with illusion, magic, and improbability. In a twenty-first-century, logic-driven, technology-obsessed age, imagination is shaped through an intense carnival and a fusion with the hyper-real, giving rise to the complete narrative—or anti-narrative. It is as if Nabarun has taken a vow not to spare any subject. After literature, his primary target is contemporary politics and political leaders. He seems to place every major party of India's multi-party democracy before an encounter squad. He exposes the cult of personality prevailing in some parties, while also laying bare the fundamentalist character of others.

To rupture this rigid chain of logic, Nabarun Bhattacharya creates a verbal intoxication of illusion and storm, and a language steeped in satire and mockery. And if we choose to see the issue this way—that social decay has reached the very soul and is no longer confined merely to the exterior—then Nabarun shows that it is the soul that has fallen ill, not the body. In this society, those entrusted with maintaining law and order are today the very violators of the law, and in many cases, criminals themselves.

From the 1970s onward, conscious novelists began attempting to break free from this closed chamber of narrative. The seeds of Nabarun's writing are scattered within the equations of that period. His effort is to dismantle the illusion of story and the stagnation of thought. Mausoleum adds another new dimension in this respect—where the counter-text governs the text. If there is no objection to large-scale hero worship such as the preservation of Lenin's dead body, then why does an uproar arise over Bhodi becoming a mummy? After all, this too is a form of personality cult.

Mausoleum thus emerges as an example of possible improbability, where, within the author's constructed world, even the impossible becomes possible.

Keywords: Illusion, magic, carnival, authoritarianism, imperialist propaganda, Lenin's mummy, Soviet science, Saptahik Vampire, textual play, Purandar Bhat's poetry, Khandani Khanki

বিশৃঙ্খল এই সময়ের বিশৃঙ্খল জীবনকে উপন্যাসে রূপদানের জন্যে আজকের আখ্যানকাররা তাঁদের লেখার মাধ্যমে যে চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন, সে চেষ্টার এক উৎকৃষ্ট উদাহরণ 'মসোলিয়ম'। জগৎ ও জীবন সম্বন্ধে আমাদের নিখাদ অভিজ্ঞতার বর্ণনা উপন্যাস নয়। বাখতিন আমাদের জানিয়েছেন 'when a man is in art,

he is not in life, and vice versa' ('Estetika' page. 5) জীবন ও শিল্প অন্যোন্যসম্পৃক্ত হয়েও দুটি এক নয়। জীবনানন্দকে একটু বদলে নিয়ে বলা যেতে পারে জীবন ও উপন্যাস একই জিনিসের দুরকম উৎসারণ বা সমালোচকের ভাষায়-

> "Both art and lived experience are aspects of the same phenomenon, the heteroglossia of words, values, and actions whose interaction makes dialogue the fundamental category of dialogism... Art and life are two different registers of dialogue that can be conceived only in dialogue."[১]

যথার্থ ঔপন্যাসিকরা তাই যথাপ্রাপ্ত জীবন ও কাহিনি চিত্রণের জাবর কাটায় নিজেদের ব্যস্ত রাখেন না। বিশেষত যখন বাস্তব হয়ে ওঠে আধিপত্যবাদের ছায়ায় আবিল, ছদ্মসত্যের কুযুক্তি ও শৃঙ্খলায় বিশৃঙ্খল, তখন আখ্যানকারদের দায়িত্ব হয়ে পড়ে এই মিথ্যার অতিস্বর ও ইচ্ছাপূরণের আয়োজনকে প্রতিহত করতে বিকল্প বাস্তবের নির্মাণ করা। নবারুণ ভট্টাচার্যের মতো আখ্যানকার এ দায়িত্ব সযত্নে পালন করেন। 'মসোলিয়ম' (এখন পর্যন্ত প্রকাশিত সর্বশেষ উপন্যাস) থেকে 'হারবার্ট' পর্যন্ত তাঁর এই সামাজিক দায়িত্ব পালনের চিত্র ছড়িয়ে আছে। তাই রমাপ্রসাদ নাগ 'নবারুণ ভট্টাচার্যর কথাবস্তু: এক প্রতিস্পর্ধী অ্যাজেন্ডা' নামক প্রবন্ধে লেখেন

> "জনজীবনের সামগ্রিক পরিসরটির কথারূপ দিতে গিয়ে নবারুণ বস্তুবাদী দৃষ্টিকোণ ও নান্দনিক চেতনা দুটি ক্ষেত্রের সমন্বয় সাধন প্রয়াসী। কবিতা দিয়ে শুরু করে গদ্য- সাহিত্য পর্যন্ত অর্থাৎ হারবার্ট থেকে মসোলিয়ম এবং অজস্র ছোটগল্পে নবারুণ ব্যঞ্জনাধর্মী কথাশিল্পের ভাষারূপটিকে প্রসারিত করেন—নির্মাণ করেন—উন্মুক্ত করেন। সমাজের আয়নার মুখোশে ঢাকা শাসনের মুখটিকে তিনি স্পষ্ট করে দেখিয়ে দিয়েছেন। মুন্ডুহীন ক্ষমতাবানদের অসারতা তুলে ধরেছেন। স্পর্ধা, অশালীনতা ও হিংস্রতার পদাটি উন্মোচন করে ক্ষমতার আধিপত্য বিস্তারের চেহারাটি স্পষ্ট করেছেন।"[২]

'কাঙাল মালসাটে' ভদির চোক্তারবাহিনী ও ফ্যাতাড়ুরা মিলে যে জবরদস্ত ঝামেলা পাকিয়েছিল, 'মসোলিয়ম'-এ সেই দুই বাহিনীর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে বনবেড়াল ও সাহিত্য সম্রাট বজয়া ঘোষ সব মিলিয়ে আরো একটা ধুন্দুমার কাণ্ড। এবার ঘটনার কেন্দ্রে মমি-ভদির মমি। আর এ ঘটনাকে জড়িয়ে জড়িয়ে ঘটে চলে একের পর এক ঘটনা। যেগুলি বাস্তব এবং অধিবাস্তবের যুগলবন্দীতে আধিপত্যবাদী প্রতিটি অবস্থানকে নস্যাৎ করে দেয়। 'মসোলিয়ম' গ্রন্থাকারে প্রকাশের আগে ২০০৫ সালে নবারুণের লেখা সম্বন্ধে তপোধীর ভট্টাচার্য 'আখ্যানের সাতকাহনে' লিখছেন-

> "...হারবার্ট থেকে 'কাঙাল মালসাট' পর্যন্ত নবারুণ ঐন্দ্রজালিক বাস্তবতাকে নিজস্ব পদ্ধতিতে গ্রহণ করে রচনা করেছেন বাস্তবের ইন্দ্রজাল। এ এমন এক বিশিষ্ট বাস্তব যাতে অধিবাস্তবের সঙ্গে দ্বিরালাপ স্বতঃসিদ্ধ আর যাতে সমস্ত আধিপত্যবাদী অবস্থানের প্রতি ঘোষিত হয় উত্তর-ঔপনিবেশিক প্রত্যাহ্বান ও প্রতিরোধ। কার্নিভালের শ্লেষ ও রাজনৈতিক অন্তর্বয়নের উত্তাপ এই পাঠকৃতিকে পণ্য-সাহিত্যের প্রতিষেধক হিসেবে উপস্থাপিত করে।"[৩]

এই মন্তব্যের প্রতিটি বাক্যই সমানভাবে প্রযোজ্য 'মসোলিয়ম'-এর ক্ষেত্রেও। বাস্তব, কাহিনি— সব কিছুই বিনির্মিত হয়েছে। আর প্রতিসন্দর্ভটিতে মিশে গেছে কুহক, ইন্দ্রজাল, অসম্ভাব্যতা। একুশ শতকের যুক্তি ও যন্ত্র-প্রযুক্তি সর্বস্ব সময়ে প্রকল্পনা নিবিড় কার্নিভাল এবং অধি-বাস্তবের মিশ্রণে তৈরি হয় সম্পূর্ণ আখ্যান বা না-আখ্যানটি। কার্নিভালের ব্যঙ্গাত্মক হাসি দিয়ে লেখক মোকাবিলা করেন বাস্তব নামক প্রহসনকে। আর 'কাঙাল মালসাট' আলোচনা কালে আগেই উল্লেখ করেছি যে, কার্নিভাল কেবল মাত্র কৌতুক নয়, কৌতুকের আড়ালে

থেকে একটু বেশি বলা, বা-

> "...আপাত-লঘু ভঙ্গিতে সরকারি মতাদর্শ ও প্রতাপ-পুষ্ট প্রাতিষ্ঠানিক সম্ভ্রান্ততার বিরুদ্ধে লোকায়তের প্রত্যাঘাত।"[৪]

শাসক শক্তি সবসময় চায় তার আধিপত্যকে বজায় রাখতে। আর ক্রিয়ার বিপরীত-মুখী প্রতিক্রিয়ার মতো শাসিত শক্তি চেষ্টা করে সেই আধিপত্য থেকে বেরিয়ে আসতে। সমাজ-সংস্কৃতি এবং সাহিত্যের সঙ্গে অবিচ্ছেদ্যভাবে জড়িত এই তত্ত্বে বলা হয় কার্নিভালের উদ্দামতার আড়ালে মূলত লুকিয়ে থাকে তীব্র সমাজ সমালোচনা। যে সমালোচনায় থাকে শাসকশক্তির প্রতি ব্যঙ্গ। এখানে আপাতত একটি অংশকে উদ্ধৃত করা যায়, উদাহরণ হিসেবে—

> "পুরন্দরের ভাগ্যটা সত্যিই খুলে গেল। যারা 'কাঙাল মালসাট' আর ফ্যাতাড়ু-র গপ্পো ছেপে ডুবেছে তারা পুরন্দরের কবিতার একটা ফোল্ডার বের করল, 'কবিবর পুরন্দর ভাটের ভাটের কবিতা'। বাংলা কবিতার কন্ট্রোল রুমে খবরটা কি পৌঁছেছিল। ডোনারকে ঐ কন্ট্রোল রুমটিতে ঢুকলে নানা রেয়ার জাতের হাফ-ডাইনো ও কতিপয় কুমিরকে কী দেখা যাবে যাদের ডিসকভারি, ন্যাশনাল জিওগ্রাফিক বা অ্যানিমাল প্ল্যানেট চ্যানেলে দেখা যায় না। এদের ধরে ধড়াদ্ধড় ক্যালানোর হাই টাইম অনেক দিন আগেই পার মারীচরণী হয়ে গেছে। যাই হোক, ওই ভেড়ুয়াগুলোকে নিয়ে কস্টলি সময় না ওয়েস্ট করে আমরা বরং পুরন্দরের কাব্য-জীবনের নতুন পর্যায়টি একটু সাইজ করতে পারি।"[৫]

এভাবে সরাসরি নবারুণের ব্যঙ্গের চাবুক আঘাত হানে সাহিত্যের ক্ষেত্রে আধিপত্যবাদী প্রতিষ্ঠানের উপর। যে নির্দিষ্ট সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠান বেতনভুক সাহিত্যিক শ্রেণির পৃষ্ঠপোষক এবং সেই পালিত সাহিত্যিকদের লেখার গতি, ধারা নির্ণায়ক, সেই প্রতিষ্ঠানকে বর্তমানের ব্যতিক্রমী ধারার লেখকরা সযত্নে এড়িয়ে চলেন। কিন্তু নবারুণ এড়িয়ে না গিয়ে সোজাসুজি তাল ঠুকে আক্রমণ করেন এই প্রতিষ্ঠানকে তাঁর লেখার মাধ্যমে। সাহিত্য এবং সাংস্কৃতিক রাজনীতির আরো কিছু বিষয় হয়ে ওঠে তাঁর ব্যঙ্গের সরাসরি লক্ষ্যবিন্দু। যেমন—

> "আশা করা যায় যে পিওর পাঁচু না হলে পাঠক বুঝতে পারবেন যে বজরা ঘোষ এক মহান ঔপন্যাসিক এবং হালের বাংলায় নভেল রচনার নামে যে ত্যাদড়া হারামিগিরি চলেছে তার মধ্যে বজরা ঘোষকে ভাবাই যায় না। বলাই বাহুল্য যে ক্রিটিকেরা আমাদের এই সুচিন্তিত মূল্যায়নের সঙ্গে একমত তো হবেনই না উপরন্তু অবজ্ঞা ভরে ঠোঁট বেঁকাইবেন। মাঝরাতে যখন মশারির ওপরে বনবেড়াল ল্যান্ড করবে তখন শালারা টের পাবে।"[৬]

অর্থাৎ এবারে নবারুণের লক্ষ্য সাহিত্য সমালোচকগণ। সাহিত্য সমালোচনার ক্ষেত্রে ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দীতে একটা ধাঁচ ছিল, পাশ্চাত্যের সাহিত্য ও সাহিত্যিকদের সঙ্গে তুলনাত্মক বিচার। তাই মাইকেল মধুসূদন দত্তকে তুলনা করা হয়েছে মিল্টনের সঙ্গে। এমনকি আধুনিকোত্তরবাদী লেখক রমানাথ রায় একটি সাক্ষাৎকারে জানিয়েছেন-

> "...পাশ্চাত্য সাহিত্যের পাশে একালের বাংলা সাহিত্যকে রাখলে বোঝা যায় আমরা কোথায় দাঁড়িয়ে আছি।'...আমরা যদি বাইরের লেখালেখি পড়ি তাহলে বুঝতে পারব, আমাদের লেখালেখি কোন জায়গায় দাঁড়িয়ে আছে। একটা জিনিস ভাল কি মন্দ, নতুন কি পুরনো সেটা বিচার করা হয় তুলনার সাহায্যে।"[৭] (অন্যায় করিনি/উপন্যাসের পেছনে প্রকাশিত সাক্ষাৎকার/১৪০৯/বইমেলা/পৃষ্ঠা-৯৬)

আর সে জন্যেই পাশ্চাত্য সাহিত্যের ধারা থেকে সরে কিছু রচনা করলে তা সমালোচকদের হালে পানি পেত না। তাই সে যুগে ত্রৈলোক্যনাথের মতো দেশীয় রচনাভঙ্গির অনুসারী লেখকের লেখা সম্বন্ধে সমালোচকরা খুব ভালো মত প্রকাশ করেননি। এমনকি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরও একে রূপকথা বলেই অভিহিত করেছেন। আর সুকুমার সেন সাদৃশ্য খুঁজেছেন ত্রৈলোক্যনাথের 'কঙ্কাবতী'র সঙ্গে লুইস ক্যারলের 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যান্ড'-এর। বাঙালি সমালোচকদের এই প্রবণতাকে কার্নিভালের হাসিতে অবজ্ঞা করার জন্যেই যেন লেখক নিজেই বনবেড়ালের হাসির তুলনা খুঁজে নেন লুইস ক্যারলের বর্ণনায়—

> "বনবেড়ালের মুখে সেই হাসি যার বর্ণনা লুইস ক্যারলের মতো কোনো মনসবদারই দিতে পারেনি।"[৮]

নবারুণ যেন প্রতিজ্ঞা নিয়েছেন তিনি কোনো বিষয়কে ছেড়ে কথা বলবেন না। সাহিত্যের পরেই তাঁর প্রধান লক্ষ্যবস্তু আজকের রাজনীতি, রাজনৈতিক নেতারা। ভারতের বহু-দল-ভিত্তিক গণতন্ত্রের প্রত্যেকটি প্রধান দলকে তিনি যেন এনকাউন্টারে দাঁড় করিয়ে দেন। কিছু দলে যে ব্যক্তিতন্ত্র চলছে তা যেমন তিনি প্রকাশ করেন, তেমনি প্রকাশ করে দেন কিছু দলের মৌলবাদী চরিত্র। আর লক্ষণীয় বিষয়, দলগুলির চরিত্র তুলে ধরার জন্য তার প্রয়োজন হয় না খুব বেশি শব্দের। কিছু শব্দের দ্বারা নির্মিত ছোটো ছোটো কয়েকটি বাক্যের মাধ্যমে তিনি অব্যর্থভাবে চিহ্নিত করেন জাতীয় এবং আঞ্চলিক কয়েকটি দলের বৈশিষ্ট্য:

> "কংগ্রেসের এক লিভারকে মিডিয়ার প্রশ্ন,
> —মমি নিয়ে আপনারা কি ভাবছেন?
> —হাই কম্যান্ড না জানালে মুখ খুলব না।
> তৃণমূলের জনৈক লিডারও ইভেসিভ,
> —দেখি উনি কি বলেন।
> বি.জে. পি-র নেতার জবাব,
> —যাঁর মমি হয়েছে তিনি কতটা নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন আমাদের খতিয়ে দেখতে হবে।
> আর. জে. ডি-র নেতা,
> —কেয়া মমিয়া মমিয়া করতে হো। হাম কেয়া কুছ কমি হ্যায়?"[৯]

আর পশ্চিমবঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষমতাসীন দলটিকে যে নবারুণ ছেড়ে দেবেন না তাঁর বাক্যবাণের লক্ষ্য থেকে এ বলাই বাহুল্য। তিনি দেখিয়ে দেন দলের কিছু কিছু বিষয় নিয়ে গোঁড়ামি। যেমন, কোনো কবিতার ভালো কি মন্দ নির্ধারিত করা হয় লেখক কোন দেশীয় তার উপর নির্ভর করে। পার্টি অফিসের মিটিং-এ দুই মন্ত্রীর কথোপকথন–

> "কবিতাটা ভালো? কিন্তু কার?
> —অ্যামেরিকান কবি অগডেন ন্যাশ্-এর।
> —তার মানে ইম্পিরিয়ালিস্ট প্রোপাগান্ডা। ওসব ফালতু জিনিস পড়েন কেন?"[১০]

আবার একই পৃষ্ঠাতে দেখি, নিজেদের দেশের প্রতিটি ব্যাপার নিয়ে সন্দেহ করতে অসুবিধা নেই। কিন্তু কিছু ক্ষেত্রে স্বাধীন মতামতকে তাঁরা রুদ্ধ করতে চান তাই— ভদির মমি নিয়ে যদি প্রশ্ন ওঠে তবে লেনিনের মমি নিয়েই বা প্রশ্ন ওঠে না কেন—এরকম কথা উঠলে কমরেড আচার্যর মন্তব্য-

> "এদের এমন সাহস যে ওরা লেনিনের মমি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। কোথায় সোভিয়েত বিজ্ঞানের যুগান্তকারীসাফল্য আর কোথায় ..."[১১]

বিশেষত বামপন্থার যে বিচ্যুতি ক্ষমতার আধিপত্যের অঙ্কে জন্ম নিয়েছে তা সম্বন্ধে তাঁর ক্ষোভ ও ক্রোধ দুই-ই বর্তমান। বিশেষত নকশালপন্থীদের প্রতি সহানুভূতিশীল লেখক ভুলে যেতে পারেন না বিভিন্ন আন্দোলন দমনে বামপন্থী সরকারের গৃহীত বিভিন্ন অত্যাচারের নমুনা— যা ছড়িয়ে আছে তার দীর্ঘ বত্রিশ বছরের ক্ষমতাসীন থাকার সময়ে। তাই নবারুণ লেখেন—

> "হুঁ হুঁ বাবা এর নাম সি.পি.এম.। যার পোঁদে লাগবে তাকে ছ্যাঁচাপোড়া করে মারবে। সারাক্ষণ লোক লাগিয়ে রেখেচে। কেউ হয়তো অন্যের বউ ফুঁসলোবে বলে তান্ত্রিক ধরে এনেচে। ঘর ভাড়া নেবে। মোড়ের মাথায় ধরে এমন সব উল্টোপাল্টা গাওনা দেবে, রগড়া দেওয়ার ভয় দেকাবে, মাল আর আসে? পুলিশে ধরবে, হাজতে নিয়ে গিয়ে ন্যাংটো করে ক্যালাবে- এসব থ্রেট শুনে ওরাও ভাবলো যে কাজ নেই বাবা। কোতায় শান্তি করে এটা-ওটা করবো, তা না, যতো উটকো হ্যাপা। শুকিয়ে মারবে। সি.পি.এম. বলে কতা।"[১২]

'সাপ্তাহিক ভ্যামপায়ার'-এর প্রসঙ্গে নবারুণ গণমাধ্যমের প্রতি তাঁর কটাক্ষ নিক্ষেপ করেছেন। প্রাক্ স্বাধীনতা ভারতবর্ষের বাংলা সংবাদপত্রের এক ঐতিহ্যময় ইতিহাস রয়েছে। হরিশ মুখোপাধ্যায়, কালীপ্রসন্ন সিংহ, ঋষি অরবিন্দ ঘোষ, কাজি নজরুল ইসলামের মতো সম্পাদক যাঁরা নিজেদের ব্যক্তি জীবনকে প্রাধান্য না দিয়ে জনসেবার উদ্দেশ্যে সংবাদপত্র প্রকাশ করে, সরকারের রোষের শিকার হয়েছিলেন। আর আজ সেইখানে সংবাদপত্রগুলির চরিত্র যা হয়েছে তা কবিতা সিংহ-এর ভাষায়-

> "আজ খবরের কাগজের প্রকৃত মালিক 'হৌস'। সম্পাদকের চেয়ে স্বত্বাধিকারীর মুখ বেশি স্পষ্ট। লেখক ও কর্মচারীরা সেই বন্ধ ঘরের অন্ধকারের রাজার নির্দেশে লাঠি ঘোরানোর খেলা খেলেন। আজ আমরা কোন 'সম্পাদকীয়' পথনির্দেশ বা প্রতিবাদী লেখা পাই না। সারা বাংলার ফোর্থ স্টেটের আজ সামনে কোন আদর্শ নেই, দাপিয়ে বেড়াচ্ছে বণিকের মানদন্ড ধনিকের রাজদন্ড হয়ে। 'যো হুকুম' বলবার জন্য লালায়িত লেখকদের ফেরুপালের মধ্যে একটা 'সিংহ'-ও নেই। সব ভিতরে ক্যাসেট ভরা পুতুল এবং ব্রেন ওয়াশড্ ভেড়ুয়ার দল।মাস-মাইনের বদলে যা বলাও বলি। যা করাও করি ।"[১৩]

স্বাভাবিকভাবেই নবারুণের মতো সংবেদনশীল লেখক সংবাদপত্রের এই চরিত্রস্খলনকে মুখ বুজে মেনে নেবেন না। ঘৃণা, ক্ষোভ, বিতৃষ্ণা সব মিলেমিশে প্রতিবাদী রূপ প্রকাশিত হয় তাঁর লেখায়। সাপ্তাহিক ভ্যাম্পায়ার-কেন প্রকাশ করা হচ্ছে লেখক জানান এভাবে—

> "— আজিকার সংবাদপত্রগুলি যে সব খবর ছাপে তাহা পড়িয়া পাঠকের কোনো লাভই হয় না। উপরন্তু ছাগলামি বাড়ে। তাই, প্রকৃত, সরেস সংবাদ সারবান পাঠককে পৌঁছাইবার নিমিত্ত এই পত্রিকা প্রকাশিত হইল। সমাজের যাঁহারা মাথা তাঁহারা আমাদের লক্ষ্য নয়। মাথা বাদ দিয়াও অনেক অঙ্গপ্রত্যঙ্গ আছে। আমাদের লক্ষ্য তারাই।"[১৪]

সংবাদপত্রের বিজ্ঞাপনে ছয়লাপ হয়ে থাকাটাও হয়ে উঠেছে আজকালকার নিয়ম। সে নিয়ম পালনের ছলে 'সাপ্তাহিক ভ্যাম্পায়ার'-বিজ্ঞাপনের জগতের প্রতি তীক্ষ্ণ 'বিদ্রুপবাণ' ছুঁড়ে দিয়েছে। আসলে এই সময়ে সমাজ-অঙ্গে পচন এতদূর পৌঁছে গেছে তাকে রোধ করা কোনো সাধারণ ওষুধের কাজ নয়। তাই এই সময়ের লিখিয়েদের তৈরি করতে হয় পাল্টা এক শক্তিশালী প্রত্যাঘাতের প্রতিনন্দন। জটিল এই সময়ের আধার-আধেয়, চিহ্নায়ক-চিহ্নায়িতদের শনাক্ত করে আবিষ্কার করতে হয় সময়-স্বভাবের অন্তবর্তী অন্ধবিন্দুগুলিকে। আর, অতি আবশ্যকীয়ভাবেই তখন তাঁদের হাতে বিনির্মিত হয় জগত ও জীবনের যাবতীয় যথাপ্রাপ্ত সন্দর্ভ। তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্য এ প্রসঙ্গে হেলগা নোভ্লোটনিকে উদ্ধৃত করে বলেন—

> "সময় স্বয়ং যখন মুখ ও মুখোশ হয়ে জটিলতায় উচ্চাবচতা বাড়িয়ে দেয় আরো, সংবেদনশীল মনে এই প্রতীতি আসে: Time here appears in the mask... which threatens, denies wishes, suppresses and expropriates them. It is the mask of time which causes suffering and which has inevitable death in stare in the end. ... Time is made by human beings and has to do with power which they exercise over one another with the aid of 2-3 strategies of time. Time unites and separates- combatants as well as lovers. As with every form of power, there is a counterpower; every strategy finds its counter strategy" (হেলগা নোভ্বোটনি: ১৯৯৪: ১৪২-১৪৩)[১৫]

এভাবেই উপনিবেশবাদ পরাজিত হয়ে আবার নতুন প্রকরণে নব্য-উপনিবেশবাদের চেহারায় আবির্ভূত হয়েছে। প্রতাপ বদলে নেয় তার কৃৎকৌশল। তৈরি হয় এক নতুন কৃষ্ণগহ্বর। প্রতাপের এই যুক্তিশৃঙ্খলাকে ছিন্ন করার জন্যে নবারুণ ভট্টাচার্য তৈরি করেন কুহক-আঁধির এক বাচনিক মাদক এবং রঙ্গব্যঙ্গের এক ভাষা। আর যেহেতু আমাদের যে কোনো অভ্যাস একটি নির্দিষ্ট যুক্তি- শৃঙ্খলকে কেন্দ্র করেই গড়ে ওঠে, তাই তাঁর লক্ষ্য হয় প্রতিটি অভ্যাসকে ভেঙে দেওয়া, প্রতিটি প্রচলিত ধারণাকে ভেঙে দেওয়া। উদাহরণ হিসেবে বলা যেতে পারে লেখক আমাদের ইতিহাস সম্বন্ধীয় ধারণাকে বদলে দিতে চেয়েছেন। কারণ এখন পর্যন্ত ভারতীয়রা যাকে ইতিহাস বলে জেনেছে তা আসলে ইংরেজদের শেখানো ইতিহাস। এমনিতেই ইতিহাস বলে যা বোঝানো হয় তা আসলে রাজা-রাজড়ার ইতিহাস, সে ইতিহাসে নিম্নবর্গের কোনো স্থান হয় না। তারপর তা ইংরেজদের নিজেদের শ্রেষ্ঠ এবং ভারতীয়দের এক বর্বর জাতি ধরে নিয়ে লেখা ইতিহাস— ফলে এ ইতিহাসের কতটা যথার্থ 'ইতি-হ-আস' তা সন্দেহ থেকে যায়। নবারুণ ভট্টাচার্য ঠিক সে জায়গাটাই ধরিয়ে দিতে চান। তাই সরখেলের কলমে লিখে চলেন-

> "ইংল্যাণ্ড দ্বীপের স্টোনহেঞ্জ ও বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে রহস্যময় বিরাট বিরাট পাথর নানা ঢঙে সাজাইয়া রাখার বহর দেখিয়া দানিকেনসহ নানা সাহেব নানা মত ব্যক্ত করিয়াছেন। প্রতিটি মতই অসার। গরু খাইলেই যে মাথায় বুদ্ধি খোলে এমনটি নয়। হয়তো পেট গরম হইবার ফলে বায়ু কুপিত হইয়া নানাবিধ আজগুবি স্বপ্ন দেখায়। এমনই একটি থিওরি হইল যে ভিগ্রহ হইতে দানবরা আসিয়া ওইসব প্রস্তরখণ্ড সাজাইয়া পালাইয়া গিয়াছে। ইহা হইতে পারে না। মানুষ ঈশ্বরের সর্বশ্রেষ্ঠ পয়দা। সে এতকাল হাঁচর পাঁচর করিয়া বড়োজোর চন্দ্র পর্যন্ত গিয়াছে, আর কোথাও যাইতে পারিবে বলিয়াও মনে হয় না। সে পারিল না আর দূর তারকামণ্ডল হইতে দানবরা আসিয়া ভূপৃষ্ঠে দৈত্যাকৃতি পাথর লইয়া লুডো খেলায় মাতিল, এ কথা উন্মাদও বিশ্বাস করিবে না। মানুষ যতদিন ধরাধামে আছে তাহা হইতে অনেক হাজারগুণ সময় ডাইনোসররা পৃথিবীতে রাজত্ব করিয়াছিল। সাহেবরাই শিখাইয়াছে যে ডাইনোরা নিরন্তর কামড়াকামড়ি করিত এবং এ উহাকে দেখিলেই হিংস্র গর্জন সহকারে তাড়া করিত। এই ভুল শিক্ষাটিকেই আমি খণ্ডন করিয়া প্রমাণ করিব যে ডাইনোরা ছিল সুশীল ও শান্ত প্রকৃতির এবং অতীব সভ্য। রান্নাঘরে বাসনে বাসনে ঠোকাঠুকির মতো স্বাভাবিক কিছু হয়তো ঘটিয়া থাকিবে কিন্তু উহা বড়ো কথা নয়। সহস্র সহস্র বৎসর থাকিতে থাকিতে ডাইনোদের মনে আমরা কী ও কেন'? এই প্রশ্ন জাগরিত হয়। বিশাল বিশাল চক্ষু মেলিয়া তাহারা নানা আধ্যাত্মিক প্রশ্নের সমাধান খুঁজিয়াছিল। ত্রিতাপের জ্বালা কতদিন আর ভোগ করা যায়? অতএব, তারা তন্ত্রসাধনার পথ ধরিয়াছিল। ওই পাথর সাজাইয়াছিল তারাই, ওইগুলি এক একটি তন্ত্রপীঠ। আমাদের যাহা 'ওঁ', তাহাদের সেটিই ছিল 'গঁঘ'। এইজন্যই দেখা যায় যে

সকল ডাইনো- মন্ত্রের গোড়াতেই সেই 'গঁক্‌ঘ'।"[১৬]

প্রচলিত চিন্তাধারার উপর বুলডোজার চালিয়ে দেন এভাবে নবারুণ। আরেকটি হিন্দুধর্মের প্রচলিত মান্যতা প্রাপ্ত ধারণা হলো দেহের মৃত্যু হয়, দেহ জরা প্রাপ্ত হয়, অসুস্থ হয় কিন্তু আত্মার এসব কিছু হয় না। আত্মা অনন্ত, অবিনশ্বর। গীতায় আছে—

"ন জায়তে ম্রিয়তে বা কদাচিদ্
নায়ং ভূত্বা ভবিতা বা ন ভূয়ঃ । অজো নিত্যঃ শাশ্বতোহয়ং পুরাণো
ন হন্যতে হন্যমানে শরীরে।" (শ্রীমদ ভাগবত গীতা /চতুর্থ অধ্যায়)

নবারুণ এ ধারণাকেও বদলে দিচ্ছেন। তাঁর লেখায় আত্মা অসুস্থ হয়। ভদির পেট খারাপ হলে মমি সাজতে অসুবিধা হবে। তাই তার উপায় দাঁড়কাক জানায় এভাবে-

> "—পরকায়া-প্রবেশ। ভেরি ইজি। ভদির বডিতে আমি ঢুকে যাব। ভদি ঢুকবে আমার বডিতে। হাগলে হেগে মরবে দাঁড়কাক। ভদি যেরকম রয়্যাল স্টাইলে মমি হয়ে আচে তেমনই থাকবে।"[১৭]

আর যদি বিষয়টিকে আমরা এভাবে দেখতে চাই যে, সমাজের পচন পৌঁছে গেছে তার আত্মায়, কেবল আর বহিরঙ্গেই তা সীমাবদ্ধ নয়। তাই নবারুণও দেখাচ্ছেন যে আত্মাই অসুস্থ হয়ে পড়ে দেহ নয়। এ সমাজে যাদের উপর ভার দেওয়া হয়েছে আইন শৃঙ্খলা বজায়ের, তারাই আজ আইন-ভঙ্গকারী, অনেক ক্ষেত্রে দুষ্কৃতকারী। 'মসোলিয়ম'-এই পাচ্ছি, পুলিশ বিভাগের উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সংলাপ-

> "... পুলিশ কি রেটে রেপ কেসে ফাঁসচে দেখে তাজ্জব হয়ে যাচ্চি।... কোথায় রেপ হবে, পুলিশ ধরবে, তা না নন-রেপিস্ট পুলিশকেই রেপিস্ট পুলিশকে ধরতে হচ্ছে। পুলিশই পুলিশকে ধরছে। প্যারাডক্সিকাল।"[১৮]

জীবনে যদি এত প্যারাডক্সে ভরে গিয়ে থাকে, তবে আখ্যানে তো তাকে আসতে হবেই। তাই এভাবে সবকিছু স্থান বদল করে নেয়। বাস্তব-অবাস্তব মিশে তৈরি হয় এক নতুন বাস্তব। যেখানে যা বলা হচ্ছে তাই যে সত্যি হবে—এমন সম্ভাবনা লেখক নিজেই মুছে দেন-

> "উপরে যাহা কিছু বলা হইল তাহা ঠিকও হইতে পারে, ভুল হইতে তো পারেই।"[১৯]

আর এভাবে নবারুণ ভেঙে দেন ঔপন্যাসিকতার প্রচলিত ধরনকেও। চল্লিশের দশক থেকে পরবর্তী পঞ্চাশ ও ষাটের দশকে বাংলা উপন্যাস হয়ে উঠেছিল বিশেষভাবে নগর ও কাহিনি কেন্দ্রিক। কাহিনির এই সুগোল বৃত্তে পাঠকরাও নিজেদের আবদ্ধ করে ফেলেছিল। আর এর ফলে সমালোচকের ভাষায়—

> "মুঠো থেকে ঝরে-যাওয়া বালির মতো কখন যে ব্যক্তিসর্বস্বতার মোহে সামাজিক সময়ের গ্রন্থনা হারিয়ে গেছে—কেউ লক্ষ করেননি। প্রকৃত ঔপন্যাসিকতাকে আমরা পরিত্রানহীন ভাবে গুলিয়ে ফেলেছিলাম 'with the script writer's stereotypic, ever-escalating and mutually invading soap-operas until it is impossible to distinguish one story, character or moral from the others, until the poor scriptwriter cracks under the once multiple but now cumulative and mangled project that falls on his, their, our heads.' (হোমি ভাবা: ১৯৯৪:৭৫)"[২০]

সত্তরের দশক থেকে সচেতন ঔপন্যাসিকরা এই কাহিনির রুদ্ধ ঘর থেকে বেরিয়ে আসতে চেষ্টা শুরু করেন। নবারুণের লেখার বীজ ছড়িয়ে আছে এই সময়ের অঙ্কেই। তাঁর প্রচেষ্টা কাহিনির মায়া, ভাবনা-চিন্তার অচলায়তনকে ভেঙে দেওয়ার। 'মসোলিয়ম'এক্ষেত্রে আরেকটি নতুন মাত্রা। যেখানে পাঠকৃতিকে শাসন করে

প্রতি-পাঠকৃতি। থেকে থেকেই কাহিনির বিন্যাস হয়ে যায় নির্মোক, যা আসলে প্রতিন্যাসের প্রবণতাকে আড়াল করে। আপাত-অসংলগ্ন অনুষঙ্গ বিন্যস্ত হয়ে উপন্যাসকে করে তোলে না-উপন্যাস। 'কাঙাল মালসাটে' আমরা দেখেছিলাম স্বয়ং লেখক নিজেকে টেক্সচুয়াল প্লে'র সঙ্গে জড়িয়ে নিয়েছেন। আর ছিল পুরন্দর ভাটের কবিতা। এবারের নতুন সংযোজন উপন্যাসের মধ্যে আরেকটি উপন্যাস, আর উপন্যাসে সংবাদপত্রের সংযোজন। 'সাপ্তাহিক ভ্যাম্পায়ারে'র অদ্ভুত খবর, সেগুলোর কোথাও কোথাও হঠাৎ বিদ্যুৎ চমকের মতো ফুটে উঠেছে সমাজের উল। চেহারা। যেমন, 'পেত্নির কুপ্রস্তাব' যেখানে এক ফাঁকে এসেছে পরিচারিকার রহস্যময় মৃত্যু বা রাতের রণক্ষেত্রে 'ছুঁচা বনাম বেড়াল' সংবাদটিতে কেমন যেন অন্ধকার জগতের দুই দলের সংঘর্ষের কথা মনে করিয়ে দেয়। আর 'মসোলিয়ম'-এ কেবল 'সাপ্তাহিক ভ্যাম্পায়ার'-এর খবর দিয়েই শেষ নয়, যোগ করা হয়েছে সচিত্র বিজ্ঞাপন। আর রয়েছে সাহিত্য সম্রাট বজরা ঘোষ প্রণীত উপন্যাস 'খানদানি খানকি'।

> "কাকভোরে বা বলিতে গেলে ঘোর শীতের প্রায় শেষ রাতে অর্ধোন্মাদ শিবনাথ ঝড়ের গতিতে তাহার ডজ ট্যাক্সি উড়াইয়া গঙ্গার জেটির দিকে ধাবমান হইল। কলিকাতার বিশিষ্ট চর্ম ব্যবসায়ী মিস্টার কক্-এর সহিত তিনমাসের জন্য খানদানি খানকি মাল্টা চলিয়া যাইতেছে। শিবনাথের কাতর ওজর-আপত্তি দৃঢ়চেতা খানদানি খানকি উড়াইয়া দিয়াছে।"[২১]

এভাবে চলেছে উপন্যাসের মধ্যে আরেকটি উপন্যাসের সংযোজন। আবার লেখক এতটুকুতেই শেষ করেননি, মসোলিয়মে' রয়েছে 'খানদানি খানকি' সম্বন্ধে আলোচনাও-

> "'মসোলিয়ম' রচনা করার বা নামানোর ফাঁকে ফাঁকে 'খানদানি খানকি'-র নিবিড় পাঠ চলিতেছে। আমরা বিস্মিত হইয়াছি—বজরা ঘোষের একটি টেকনিকে। সেটি হল নিজের উপন্যাসের মধ্যে স্বনামে লেখকের আবির্ভাব। নিজের নাম না করিয়া যেমন নিজের ছবিতে অটোগ্রাফের মতো উপস্থিত হইতেন ভীতিপ্রদ আলফ্রেড হিচকক।"[২২]

অর্থাৎ তাঁর মূল অভিনিবেশ হচ্ছে অন্তর্বয়নের অন্তহীন গ্রন্থনায়। তাই বোধহয় আখ্যানে ন্যস্ত হয় এত ভিন্ন ভিন্ন আঙ্গিক। আবার নবারুণের অগোছাল সন্নিবেশের ধরনে মনে হয় এসব হয়তো একেবারে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কলমের ডগায় এসে যাওয়া। কিন্তু একটু অভিনিবেশ সহযোগে পাঠ করলে বোঝা যায় এই অগোছাল সন্নিবেশের আড়ালে একটি শক্ত মুঠোতে ধরে আছে সবকিছুর রাশ। এবং যথোচিত চিন্তাভাবনা করেই প্রতিটি বাক্য লেখা হয়েছে। আর বিদূষণ ও ক্ষয়ের সংক্রমণে সংক্রামিত রাষ্ট্র-পৌর-সমাজ-রাজনৈতিক ব্যবস্থা-বৌদ্ধিক সমাজের অন্তঃসারশূন্যতা এবং ইতরতাকে নগ্ন করে দেওয়া হয় পক্ষপাতহীন কার্নিভাল দিয়ে। সমালোচক তথা তাত্ত্বিক তপোধীর ভট্টাচার্যের ভাষায়—

> "জীবনকে যখন ফাঁপা খোলস বলে মনে হয়, মুখোসের ভিড়ে দমবন্ধ হয়ে আসে –বাস্তব কী, কাহিনি-ই বা কোথায়! প্রতিবাস্তব আর প্রকল্পনার নাগরিক কুহক যেন প্রতিষেধক হয়ে ওঠে তখন। সবকিছু যদি নারকীয় বিশৃঙ্খলা বলে প্রতিভাত হতে থাকে, প্রণালীহীনতার তুমুল হট্টরোলের মধ্যে প্রণালী খুঁজে নিতে পারেন কোনো ব্যতিক্রমী কথাকার। যে প্রজন্ম যুগপৎ শিকড়হীন ও আকাশহীন, আধুনিকতাবাদী পর্যায় পেরিয়ে এসে তা আর চোরাবালি কিংবা পোড়ো জমির আকল্প খোঁজে না। বরং 'fragments of nonsense' দিয়ে তৈরি করে নেয় সূচনাহীন সমাপ্তিহীন না- কাহিনির উৎসব-মত্ততা। প্রতিটি পরম্পরা বিচ্ছিন্ন অথচ অমোঘভাবে অন্যোন্য- সম্পৃক্ত অনুচ্ছেদে লক্ষ করি গন্তব্যহীন যাত্রার প্রবর্তন। যাতে নিরবচ্ছিন্ন যাত্রাই লক্ষ্য। সব কিছু শেষ হচ্ছে কানাগলিতে তবু এদের মধ্য থেকে তৈরি হয়ে যাচ্ছে পাকদন্ডি পথ।"[২৩]

আর তাই প্রচলিত ভাষা ব্যবহারের রীতি আর মান্যতাপ্রাপ্ত শব্দ প্রয়োগের পন্থাকে কলমের হাল্কা আঘাতে বিদেয় দেন। কারণ এও একরকমের অভ্যাস—ভাষা সম্বন্ধীয় ছুৎমার্গীয় সংস্কার। আর তাই তো সাধু ও চলিত ভাষারীতির মিশ্রণটি 'গুরুচণ্ডালী দোষ' নামে পরিচিত। এর থেকেই বোঝা যাচ্ছে ভাষার সংস্কারে কেমন করে ঢুকে গেছে প্রতাপের বয়ান। আর নবারুণের মতো লেখক, যাঁর উদ্দেশ্যই প্রতাপের সব সদর দপ্তর ভেঙে গুড়িয়ে দেওয়া, স্বাভাবিকভাবেই ভাষা- সংস্কারের মতো প্রতাপের একটি ঘাঁটিকে ছেড়ে দেবেন না। তাঁর নিজের ভাষায়-

> "মহাপণ্ডিতদের ফুৎকারে, মান্য ভাষা না মেনে চলার অপরাধে, কত কত সাহিত্যকর্মী যে উড়ে গেছে তা শুনে শেষ করা যাবে না। কিন্তু উড়ে যেতে যেতে তারা সকলেই বলেছে 'অনেক ভাটিয়েছেন, এবারে ফুটুন'। হাংগ্রি-রা থাকলে অবশ্যই বলতেন, যেমন তাঁরা বলেওছিলেন—— 'এবার তবে মুখের মধ্যে লাগিয়ে নিন লুপ'। আমরা না হয় কুলুপই বললাম। বাংলায় মানেটা এই যে ভাষাকে রক্তহীন, অযৌন, প্লাস্টিকগন্ধী ও ঢ্যামনা করে দেওয়ার একটা চেষ্টা আছেই। আমাদের কাজ হল এইসব সচেষ্টদের বাংলা মতে ক্যালানো। আগে তেরপল চাপা। তারপর খেঁটো বাঁশ।"[২৪]

নবারুণ ভট্টাচার্য চাকরিসূত্রে দীর্ঘদিন সোভিয়েত রাশিয়াতে ছিলেন। একজন বামপন্থী হিসেবে সোভিয়েত রাশিয়ার প্রতি কিছু স্বপ্ন নিশ্চয় তাঁরও ছিল, কিন্তু তাঁর প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় তিনি দেখেছেন খুব ভালো নেই সোভিয়েতের দেশগুলো। বিশেষত বীরপূজাকে কোনো যথার্থ বামপন্থীর পক্ষেই মেনে নিতে পারার কথা নয়। কারণ-

> "ইতিহাস সাক্ষ্য দেয় সোভিয়েতে বীরপূজা প্রচলিত হয়েছিল যেদিন, সেদিন থেকে প্রাধান্য পেতে থাকে সমাজতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধ এক চেতনা। অত্যাচার ও নিপীড়নে স্তব্ধ হয়ে যায় বিরুদ্ধবাদী কণ্ঠস্বর।"[২৫]

স্বাভাবিকভাবেই নবারুণও তাই ভালোভাবে মেনে নিতে পারেননি লেনিনের মমি বানিয়ে রাখা। কারণ এও তো বীরপূজারই উপাচার। তাই লেনিনের মৃতদেহ না দেখাকে তিনি সৌভাগ্য হিসেবে বর্ণনা করেন। তাঁর ভাষায়—

> "সোভিয়েত ভ্রমণে একটি সৌভাগ্য আমার হয়েছিল। ক্রেমলিনে, মসোলিয়ামে সুরক্ষিত লেনিনের মৃতদেহ আমাকে দেখতে হয়নি। কারণ তখন সোভিয়েত মৃতদেহ সংরক্ষণবিদরা সেটিকে নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন, ফি বছরই এরকম একটা সময় মসোলিয়াম বন্ধ থাকে। মানুষকে নিয়ে 'ঈশ্বর নির্মাণের' ঘোর বিরোধী ছিলেন লেনিন।"[২৬]

এটাও কি একটা কারণ 'মসোলিয়ম' রচনার। যার মাধ্যমে নবারুণ তাঁর বিরক্তি প্রকাশ করলেন ব্যক্তি পূজা সম্বন্ধে। ভদিরমমি সূত্রে প্রশ্ন তোলা হয় লেনিনের মৃতদেহ সংরক্ষণ সম্বন্ধে। যারা জানে না, তাদের জানিয়েদেওয়া হল লেনিনের স্ত্রী ক্রুপস্কায়ার মত ছিল না। আবার এর সঙ্গে লেখক ঠাকুরের ইচ্ছে'। তাদের 'রিচুয়াল সার্ভিস' নামক একটা ব্যবসা। যেখানে গ্যাংস্টারদের ছিন্নবিচ্ছিন্ন জুড়ে দিয়েছেন আরো কিছু সূত্র। যেমন, লেনিন মসোলিয়ম ল্যাবরেটরির বিজ্ঞানীর মুখে সবই লাশগুলোকে অন্তিম যাত্রার জন্য সাজিয়ে-গুছিয়ে তোলার কাজ করা হয়। সবকিছু মিলিয়ে এক অদ্ভুত পরিবেশ। যা হোক, আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যাই। লেনিনের মৃতদেহ সংরক্ষণের ঘটনার মতো বড়ো স্তরীয় বীর পূজায় যদি কারো আপত্তি না থাকে তবে ভদির মমি হওয়া নিয়েই ওঠে কেন! কারণ এ তো সেরকমই একটা ব্যক্তিপূজার ঘটনা। প্রশ্ন তবে এক্ষেত্রে প্রশ্ন আরেকটাও হতে পারে যে মমি হওয়াটা কতটুকু সত্যি বা মিথ্যা। লেনিনের মৃতদেহ সংরক্ষিত হয়েছে বৈজ্ঞানিক উপায়ে, এক্ষেত্রে পদ্ধতিটা বৈজ্ঞানিক নাকি ধাপ্পাবাজি! কথাটা হল এই বিজ্ঞানও আজ অব্দি অনেক রহস্যের

কিনারা করে উঠতে পারেনি, আমাদের জানার পরিধির থেকে না জানার পরিধি কয়েক শত-হাজার গুণ বেশি। তাই দেখি, আমাদের বিচারে অসভ্য জনজাতিরাও কিছু কিছু ব্যাপারে তথাকথিত শিক্ষিতদের চেয়ে বেশি জানে। 'মসোলিয়ম' সে ইঙ্গিতও দিয়েছে—

"–ও কি বলবে? ওয়াইল্ড একটা ক্রিচার, র মিট খায়!

–দ্যাখো মমির সাবজেক্টটা নিয়ে ও একজন অথরিটি, বুঝলে? লং বিফোর দা ফাকিং সাহিবস্, যখন লোকাল চোরগুলো পিরামিডে ঢুকত, ঢুকেই ওকে দেখতে পেত। ইজিপশিয়ান মমি তো হ্যাডি একটা ব্যাপার, বুদ্ধিস্ট মমি সম্বন্ধে ওই আমাকে এনলাইটেন করে। ... ... মোস্ট থ্রিলিং। এখন দেখচি বুনো বানচোতটাকে এতদিন কাঁচাখেকো বলে আন্ডার এস্টিমেটই করে এসেচি।"[২৭]

আর বিশেষত, বিজ্ঞান যেখানে মানুষকে অধীনস্থ করে রাখার, মানুষকে মারবার অস্ত্র হিসেবে ব্যবহৃত হচ্ছে, সেখানে বিজ্ঞানের প্রবেশও বোধহয় নবারুণের তৈরি জগতে নিষিদ্ধ হয়ে যায়। কারণ এ এক আশ্চর্য প্রকল্পনার জগৎ। এখানে বিজ্ঞানের আইনগুলোও উল্টোপাল্টা হয়ে যায়। তাই—

> "নর্দমার পাশের টগর গাছ হইতে বৃন্তচ্যুত একটি টগরফুল মাঝ আকাশে দাঁড়িয়ে যায় যেন এই সঙ্কেতই দিতে যে নিউটনের নিয়ম এই পরিবেশে অচল।"[২৮]

তাই বদলে যায় সময় ও পরিসরের সাধারণ হিসেব নিকেশটুকুও। সময়ের চলমানতা ও পরিসরের স্থবিরতার নিয়ম পাল্টে যায়। সময় একই থাকে, কিন্তু পরিসর বদলে যায়। অর্থাৎ একটি ব্যক্তি একই সময়ে উপস্থিত হয় ভিন্ন ভিন্ন জায়গায়-

> "বনবেড়াল ও দাঁড়কাক ঠিক যে টাইমে পেদোকে চমকাচ্ছিল সেই একই টাইমে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের মহা মাগিবাজ কিউরেটর ও অন্যান্য বিস্তর খ্যাতিমান ঢ্যামনার সঙ্গে ওই একই দাঁড়কাক ও বনবেড়ালের সাক্ষাৎ হয়েছিল.... ।"[২৯]

ক্রোনোটোপের রৈখিক বিন্যাস ভেঙে যায়। যা ঘটে বা বলে বোধ হয়, তা ঘটে না। সম্ভাবনার মুক্তি-বিধায়ক দিগন্ত প্রকট হয়ে পড়ে অন্তর্ঘাতের লাগাতার বিস্ফোরক উপস্থাপনার সূত্রে প্রসঙ্গে বলে নেওয়া ভালো, আইনস্টাইন-এর আপেক্ষিকতার তত্ত্ব থেকে উদ্ভাবিত 'ক্রোনোঢোপ' শব্দটির সংজ্ঞা বাখতিন-এর অনুসরণে বলা যায়— সময়গত ও স্থানিক সম্পর্কের সহজাত সংশ্লিষ্টতা যা সাহিত্যে শৈল্পিকভাবে প্রকাশিত হয়। আবার পুরোনো প্রসঙ্গে ফিরে যাওয়া যাক, আসলে লেখক এভাবে ভেঙে দেন সম্ভব ও অসম্ভবের মধ্যেখানের দেওয়ালটুকু। আর 'মসোলিয়ন' হয়ে ওঠে সম্ভব অসম্ভাব্যতা (possible improbability)-র নিদর্শন। যেখানে লেখকের নির্মিত জগতে সব অসম্ভবও সম্ভব। একই চরিত্র একই সময়ে বিভিন্ন জায়গায় যেতে পারে। টগরফুল পড়তে পড়তে মাঝপথে আটকে থাকতে পারে। ভূতেরা তো থাকেই, রীতিমতো টি.ভি.তে পুরোনো ক্রিকেট ম্যাচের সরাসরি সম্প্রচার দেখতে পারে। মনুষ্যেতর প্রাণীরা কথা বলতে পারে। এই অবাস্তবগুলো লেখকের জগতে ঘটে। আবার এগুলোকে অবাস্তবই বা বলব কেন? বাস্তবে ঘটছে পুরোপুরি এরকম না হলেও কাছাকাছি এ ধরনেরই ঘটনা। মানুষের কণ্ঠকে দাবিয়ে দিয়ে কথা বলছে মানুষের মধ্যে থাকা সব অমানুষ। যে কোনো কাজ অনায়াসে মাঝপথে আটকে দিতে পারে ক্ষমতাশালীরা কেবল নিজেদের স্বার্থে। মৃত ব্যক্তিরা ভোট দিতে যায়। খুনীরা, অপরাধীরা আদালতে প্রমাণ করে ঘটনার সময় তারা দেশেরই বাইরে ছিল। এই যদি হয় বাস্তব তবে 'মসোলিয়মে' বর্ণিত ঘটনাগুলোকেই বা অবাস্তব বলি কীভাবে? সেই ঘটনাগুলির মধ্যে আসলে মিশে গেছে সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্তৃত্ববাদের বিরুদ্ধে, সমাজের নানা অসঙ্গতির প্রতি তীব্র তীক্ষ্ণ শেষ। এখানে তাই সত্য ও মিথ্যাও মিশে যায়। কারণ সত্য ঠিক কি এবং কতটা, তা কি নির্ধারণ করা সম্ভব? আবার শাস্ত্রেই আছে, যে সত্য কারো অপকার করে তা না বলাই ভালো। অতএব সত্যের এটাও একটা চেহারা। 'মসোলিয়মে'ও

তাই দেখি সত্য প্রকাশিত হলে কেউ হাসতে পারে না, তৈরি হয় এক অশ্রু আর্দ্র-করুণ পরিবেশ—

> "দাঁড়কাকও কাঁদতে কাঁদতে লুটিয়ে পড়ে। গোলাপ মল্লিক কাঁদতে থাকে। তিনজন ফ্যাতাড়ুও কাঁদতে থাকে। এত কান্নায় লেখকও বেসামাল। পাঠক, বিশ্বাস করুন বা নাই করুন, লেখকও এখন কাঁদছে।"[৩০]

এভাবে লেখক নিজেও ঢুকে পড়েন উপন্যাসের বয়ানে। বজরা ঘোষের মতো স্বনামে সশরীরে না প্রবেশ করলেও লেখকের এভাবে প্রবেশ বেশ 'নতুন একটি মাত্রা সংযোজিত করে' বৈকি। সরকারি বয়ান পরম্পরাকে ধ্বংস করার জন্যেই বোধহয় এবার রচিত হয় ভদি-অভিধান'। কারণ শব্দেও তো লুকিয়ে থাকে প্রতাপের কৃৎকৌশল। তাই শব্দকে নতুনভাবে ভেঙে গড়ে নিয়ে রচিত হতে থাকে পুরন্দর ভাটের 'ভদি-অভিধান'। আর তার কবিতাগুলো তো আছেই যাদের অবজ্ঞা করা কার সাধ্য—

> "শুধু পরা ব্ল্যাক বেল্ট
> আর কিছু নাই
> আয়নায় করিতেছে
> তুমুল লড়াই"[৩১]

আরেকটা বিষয় লক্ষণীয়, 'ফ্যাতাড়ুর বোম্বাচাকে' তুমুল হট্টগোল সৃষ্টি করা ফ্যাতাড়ু 'কাঙাল মালসাটে' ভদির চোক্তার বাহিনীর অন্যতম নলেনের হাতে প্রায় ধরাশায়ী হয়ে গেছে। আবার— 'মসোলিয়মে' এসে কবি পুরন্দর ভাটকে রীতিমতো ভড়কে দিয়ে প্রবেশ ঘটেছে 'খানদানি খানকি' সহ সাহিত্য সম্রাট বজরা ঘোষের। দণ্ডবায়সের সমান ক্ষমতাধারী তার বন্ধু স্থানীয় বনবেড়ালেরও প্রবেশ ঘটেছে এ উপন্যাসে। অর্থাৎসব মিলিয়ে আমরা বলতে কি পারি না যে নবারুণ কোনো নির্দিষ্ট দল বা ব্যক্তির হাতে বিদ্রোহের সব ক্ষমতাটুকু দিতে চান না। কারণ ভয় থাকেই কখন কে ক্ষমতার সবটুকু 'আলুর চপের মতো' খেয়ে নেবে। তাই চলতে থাকে ক্ষমতার এই বিকেন্দ্রীকরণ। সাতাত্তর পাতার এ উপন্যাসে এ ভাবে নবারুণ বিচিত্র উৎসজাত অন্তর্বয়নের সূক্ষ্ম ও অরৈখিক সমাবেশকে ব্যবহার করেছেন সুকৌশলে। হুজুগে বাঙালি জাতির চরিত্র চিত্রণও বাদ যায় না। মমি বেরোনোর খবরের প্রতিক্রিয়া দেখাতে গিয়ে বাঙালির এই চরিত্র বৈশিষ্ট্য লেখক তুলে ধরেন-

> "খবর কি করে কয়েক মিনিটের মধ্যে শহরের এমুড়ো থেকে পাঁচমাথা হয়ে ও মুড়োয় পৌঁছে দেওয়া যায় সে সম্বন্ধে গণেশের দুধ প্যাঁদানোর বেলাতেই কলকাতা ট্রায়াল দিয়ে রেখেছিল। মমির বেলাতে সেই ট্রায়ালের সুফল পাওয়া গেল। বস্তি এলাকায় শুরু হয়ে গেল মমি-ডান্স। মোড়ে মোড়ে মমি-বিরিয়ানি ও মমি-রোলের দোকান বসে গেল। ভদ্দরলোকেদের পাড়ায়ও অন্যথা হল না। চল্লিশ কিলো ওজনের এক-একটা বাচ্চা স্কুল থেকে ফিরে ম্যাগি গিলতে গিলতে বায়নাক্কা জুড়ে দিল— মমি দেখব, মামি, মমি দেখব!"[৩২]

এখানে লক্ষ্য করার বিষয় হল শ্রেণিগত বৈষম্য থাকলে বাঙালির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য মোটামুটি— ভাবে এক, প্রকাশে হয়তো একটু রকমফের হতে পারে। তাই- 'বস্তি এলাকা এবং ভদ্দরলোকেদের পাড়া' দু'জায়গাতেই এই ঘটনাটি আলোড়ন তোলে।

আখ্যানবিহীন এই আখ্যান শেষ হচ্ছে কাহিনির হালকা এবং সূক্ষ্ম সূতোটুকু গুটিয়ে নিয়ে। ভদির যে কারণে মমি হওয়া, যার জন্যে বনবেড়ালের উত্তরবঙ্গ থেকে কলকাতায় আসা, বেগম জনসন, দাঁড়কাক, ফ্যাতাড়ু ও চোক্তার বাহিনীর তৎপরতা সেই কারণের যথেষ্ট ফলবান কার্যে রূপান্তরিত হওয়ার পর অর্থাৎ যথেষ্ট পরিমাণে হুজ্জুতি বাধিয়ে, নাম কামিয়ে এবং মাল কামিয়ে (যাতে করে এর পরে নাইদার দা চোক্তারস্ নর দা ফ্যাতাড়ুজ প্লাস যারা আমাদের দলের— কারও যেন কোনো ফিনান্সিয়াল ডিফিকালটি না হয়।) পুরো দল

উত্তরবঙ্গ অভিমুখে যাত্রা করছে। এই যাত্রায় আখ্যানটির সমাপ্তি। একে সমাপ্তি বলব নাকি আরো একটা ঘটনার আরম্ভ বলব। নিটোল কাহিনি ও সূচনা-সমাপ্তি বিহীন আজকালকার উপন্যাসেও ছোটগল্পের সেই 'শেষ হইয়া হইল না শেষ'-এর আমেজ জড়ানো থাকেই। আর 'কাঙাল মালসাটে'র পরে 'মসোলিয়ম' পেয়ে পাঠকের প্রত্যাশা কি রয়ে যায় না এরপরের হাঙ্গামা উত্তরবঙ্গে। যদিও প্রতিশ্রুতি রয়েছে বেগম জনসনের কাছে না কি পাঠকের কাছেই—

"মাত্র তো মাস দুয়েক। তারপরেই তো সবাই আবার ফিরে আসবো।"

তবু প্রত্যাশা জাগে দুমাসের কথা কিছুই কি জমবে না ফ্যাতাড়ু আর চোক্তারদের। আর নবারুণ উপন্যাসের শেষে এসেও তার ব্যঙ্গের চাবুক যে নামিয়ে রাখেননি তার প্রমাণ দেন এইভাবে লিখে—

"দুমাসে লোকে মমির কথাও ভুলে যাবে। তারপর, যে কে সেই।"

তাই তো আমরা সবই ভুলে যাই। নকশালদের আন্দোলন, স্বাধীনতা সংগ্রামীদের আত্মত্যাগ, তাজ হোটেলে সন্ত্রাসবাদীদের আক্রমণ, কালাহান্ডির কংকালসার শিশু অথবা পাঠশালার সেই শিক্ষক-শিক্ষিকা, স্কুলের সবচেয়ে ভালো বন্ধুটি কিংবা অনেকগুলো কথা যেগুলো 'রাখব' বলেছিলাম। আর তাই বাক্যটি পড়ে সত্যজিৎ রায়ের লালমোহন গাঙ্গুলীর মতোই বলে শেষ করতে ইচ্ছে করে

- "থ্যাঙ্কস ফর দ্যা খোঁচা।"

তথ্যসূত্র:

১. Holquist, Michael. Bakhtin and his world: Dialogism. Routedge, London, 2002. page-111.
২. সরকার, নীলকমল সম্পাদিত। (সংখ্যাটির সম্পাদনা- রাজীব চৌধুরী), অক্ষরেখা। ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ৯২।
৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর। আখ্যানের সাতকাহন। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর ৭২১১০১, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ২২।
৪. তদেব, পৃ. ৮১।
৫. ভট্টাচার্য, নবারুণ। মসোলিয়ম। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০০৬/মাঘ ১৪১২, পৃ. ৫৮।
৬. তদেব, পৃ. ৩৯।
৭. ভট্টাচার্য, তপোধীর। আখ্যানের সাতকাহন। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুব- ৭২১১০১, জানুয়ারি ২০০৫, পৃ. ৮০।
৮. ভট্টাচার্য, নবারুণ। মসোলিয়ম। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০০৬/মাঘ ১৪১২, পৃ. ১৮।
৯. তদেব, পৃ. ৬০।
১০. তদেব, পৃ. ৬৮।
১১. তদেব, পৃ. ৬৮।
১২. তদেব, পৃ. ১৬।
১৩. চৌধুরী, কমল সম্পাদিত। স্বাধীনতা ৫০ পেরিয়ে। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ১৯৯৯/মাঘ, ১৪০৫, পৃ. ৩৩৫।
১৪. ভট্টাচার্য, নবারুণ। মসোলিয়ম। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০০৬/মাঘ ১৪১২, পৃ. ২৬।

১৫. ভট্টাচার্য, তপোধীর। উপন্যাসের সময়। এবং মুশায়েরা, কল-৭৩, জানুয়ারি ২০০৯/পৌষ ১৪১৫, পৃ. ৪৫।
১৬. ভট্টাচার্য, নবারুণ। মসোলিয়ম। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০০৬/মাঘ ১৪১২, পৃ. ৪৪-৪৫।
১৭. তদেব, পৃ. ৬১।
১৮. তদেব, পৃ. ৫২-৫৩।
১৯. তদেব, পৃ. ৪৬।
২০. ভট্টাচার্য, তপোধীর। উপন্যাসের সময়। এবং মুশায়েরা, কল-৭৩, জানুয়ারি ২০০৯/পৌষ ১৪১৫, পৃ. ১০৫।
২১. ভট্টাচার্য, নবারুণ। মসোলিয়ম। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০০৬/ মাঘ, ১৪১২, পৃ. ৩৮।
২২. তদেব, পৃ. ৩৯।
২৩. ভট্টাচার্য, তপোধীর। আখ্যানের সাতকাহন। অমৃতলোক সাহিত্য পরিষদ, মেদিনীপুর-৭২১১০১, জানুয়ারি, ২০০৫, পৃ. ১৩১-১৩২।
২৪. সরকার, নীলকমল সম্পাদিত। (সংখ্যাটির সম্পাদনা—রাজীব চৌধুরী), অক্ষরেখা। ফেব্রুয়ারি ২০০৮, পৃ. ২৯৮।
২৫. তদেব, পৃ. ৬৮।
২৬. তদেব, পৃ. ৩১৬।
২৭. ভট্টাচার্য, নবারুণ। মসোলিয়ম। দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা-৭৩, জানুয়ারি ২০০৬/মাঘ ১৪১২, পৃ. ৪৭-৪৮।
২৮. তদেব, পৃ. ১৮।
২৯. তদেব, পৃ. ৩১।
৩০. তদেব, পৃ. ৩৪।
৩১. তদেব, পৃ. ৪৩।
৩২. তদেব, পৃ. ৫২।